মুশাজারাতে সাহাবা

(সাহাবায়ে কেরামের মতভিন্নতায় উম্মাহর করণীয়)

ইমরান রাইহান

চেতনা প্রকাশন

সূচিক্রম

ভূমিকা—০৯

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসকে ঘিরে কিছু সংশয় ও তার অপনোদন—১৫

মুশাজারাতে সাহাবা :
মূলনীতি ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা—২৩

কয়েকটি ইতিহাসগ্রন্থ ও ইতিহাসবিদ :
মুশাজারাতে সাহাবাসংক্রান্ত ইতিহাস গ্রহণে সতর্কতা—২৭

ফাজায়িলুস সাহাবা—৩৫

সাহাবিদের সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআতের আকিদা—৪০

মুশাজারাতে সাহাবাসংশ্লিষ্ট কয়েকজন সাহাবির সংক্ষিপ্ত জীবনী—৪১

ফিতনা সম্পর্কে নবিজির ভবিষ্যদ্বাণী—৬৯

ফিতনার বিবরণ : পর্দার আড়ালে প্রস্তুতি—৭৫

দৃশ্যমান ফিতনা—৮৭

উসমান রা.-এর শাহাদাত—১০৫

উসমান রা.-এর শাহাদাত—কিছু সংশয় ও সমাধান—১১০

হত্যার বিচার প্রসঙ্গ—১১৫

জংগে জামাল—উটের যুদ্ধ—১২৯

সংক্ষেপে জংগে জামালসংক্রান্ত কয়েকটি মৌলিক কথা—১৩৬
জংগে জামালসংক্রান্ত সংশয় ও সমাধান—১৩৭
জংগে সিফফিন—১৪৩
তাহকিমের (সালিশের) ঘটনা—সত্য-মিথ্যার বেসাতি—১৫৭
সংক্ষেপে জংগে সিফফিনসংক্রান্ত কিছু মৌলিক কথা—১৬০
জংগে জামাল ও জংগে সিফফিনে অংশগ্রহণকারী সাহাবিদের সংখ্যা—১৬০
জংগে সিফফিনসংক্রান্ত সংশয় ও সমাধান—১৬২
জংগে জামাল ও জংগে সিফফিন সম্পর্কে
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআতের অবস্থান—১৬৭
শেষকথা—১৬৯

পরিশিষ্ট [এক]
কারবালার ইতিহাসপাঠ : প্রাসঙ্গিক কয়েকটি বিষয়—১৭২
পরিশিষ্ট [দুই]
হাসান বসরির কথিত উক্তি পর্যালোচনা—১৮২

ভূমিকা

এক.

সাহাবায়ে কেরামের ইজতিহাদভিত্তিক মতভিন্নতা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে অবধারিত। কোনোরূপ দ্বিধা ছাড়া এ কথা অকপটে বলা যায়, পারতপক্ষে কোনো সাহাবির অন্তঃকরণে বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না, মুসলিমদের মাঝে অনাকাঙ্ক্ষিত অনাহুত কোনো হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটুক, কিংবা তারা একে অন্যের রক্তে রঞ্জিত হোক! বরং তাঁরা সকলে আপন জায়গা থেকে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিলেন, যেন অযথা রক্তপাত না হয়, এবং যথাসাধ্য যুদ্ধ এড়ানো যায়। কিন্তু যদি আরশে আজিমে পূর্ব নির্ধারিত কোনো ফায়সালা থেকে থাকে, তাহলে কী-ই বা আছে করার, এবং কার-ই বা সাধ্য আছে তা খণ্ডাবার?

দুই.

মনে রাখতে হবে, ঐতিহাসিক বর্ণনা আমাদেরকে কেবল কিছু তথ্য দেয়, কিছু ব্যাপারে ধারণা দেয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে কী হয়েছিল বা ঘটেছিল, তা পুঙ্খানুপুঙ্খ জানা কেবল আলিমুল গাইব মহান আল্লাহর অধিকার। কোনো বান্দার সাধ্য নেই, এ ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ হুবহু জ্ঞান লাভ করার, বা এই দাবি করার যে, সে এ ব্যাপারে সবকিছু জানে। বান্দা সর্বোচ্চ তার স্বচক্ষে দেখা বা বিশুদ্ধ বর্ণনামতে প্রাপ্তজ্ঞানটুকুই বলতে পারে, এর বেশি না। এরপরও কত ভুল হয়ে যায়! কারণ, মানুষ তার সীমাবদ্ধতার কারণে আপন সময়ে-ই জগতের সবকিছু হুবহু বলতে পারে না। তাহলে কী করে হাজার বছর পূর্বে ঘটিত কোনো ঘটনাকে অক্ষরে অক্ষরে বর্ণনা করে, এক পক্ষকে সত্য সাবিত করে, অন্য পক্ষকে মিথ্যা পর্যবসিত করবে! অথচ এ-সংক্রান্ত ঘটনার বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বাইরে শিয়া, খারিজি, রাফিজি, নাসিবি-সহ একাধিক অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী এবং ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংসের লক্ষ্যে তাদের জালকৃত অসংখ্য মিথ্যা বর্ণনা বিদ্যমান।

তাই পরিমিত শাস্ত্রজ্ঞান, প্রাজ্ঞ আলেমের সোহবত ও আল্লাহ-প্রদত্ত সঠিক দীনি অভিরুচি না থাকলে, যেকোনো বর্গের ভুল-শুদ্ধ যেকোনো বর্ণনাকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে, যে কাউকেই ওপরে উঠাবে, নচেৎ নিচে পাঠিয়ে লাঞ্ছিত করবে। অথচ শাস্ত্রজ্ঞান, প্রাজ্ঞ আলেমের সোহবত ও আল্লাহ-প্রদত্ত সঠিক

দীনি অভিরুচিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, কেবল একান্ত প্রয়োজনে বিশুদ্ধ বর্ণনাগুলো সামনে রেখে জেনে নেয়, আসলে ঘটনা কী ঘটেছিল।

তিন.

প্রসঙ্গ টেনে বলতে হয়, ফিতরাত বা সত্তাগত সত্যগ্রহণের যোগ্যতা যদি কোনো কারণে কারও নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার পক্ষে সত্যগ্রহণ করা ভারী দুষ্কর হয়ে পড়ে। সত্যের বদলে মিথ্যা, সাদার বদলে কালো তার কাছে অধিক উজ্জ্বল ও শোভন বলে ভ্রম হয়। বান্দার প্রতি আল্লাহর বিশেষ ইহসান এই যে, তিনি তাকে সত্যের প্রতি আজন্ম আকর্ষণ ও মিথ্যার প্রতি নিপাট ঘৃণা, জন্মগতভাবে তার ভেতর সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যদি সে এই গুণগুলো কোনো কারণে নষ্ট করে ফেলে, তাহলে তার সত্যগ্রহণ করা হয়ে উঠে না। কারণ সে সত্যগ্রহণে তার মৌল যোগ্যতা বিনষ্ট করে ফেলেছে।

সীমিত সময়ের জন্য অন্য ব্যাপারগুলো বাদ দিয়ে, কেউ যদি শুধু তার ভেতর উপ্ত সত্তাগত সততার যোগ্যতা দিয়ে চিন্তা করে, তাহলে সে কীভাবে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহর সাহাবিদের নিয়ে জবান দারাজি করতে পারে? তাবৎ পৃথিবী-চষে সে কী তাঁদের অনুরূপ কাউকে দেখাতে পারবে? তাহলে তাঁদের ইজতিহাদভিত্তিক মতভিন্নতার প্রতি সে কীভাবে বিদ্বেষ পোষণ করে? বদগুমান রাখে? এ অসম্ভব! একদম অসম্ভব! চূড়ান্ত অসম্ভব! তার অবচেতন মন ও স্বাভাবিক বোধের স্তর, তাকে এমন করতে দেবে না। সে মুখ খুলতে পারে না। দীনের সামান্য বুঝ, নগণ্য সমঝ আর আত্মমর্যাদাবোধ থাকলে সে এমন করতে পারে না। এই দীনের জন্য সাহাবায়ে কেরাম কোন কুরবানিটা দেন নাই? ইমান আনার পর গোটা জীবনটাই তো তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলে জন্য বিলিয়ে দিয়েছেন! তো সে সাহাবিদের পারস্পরিক সামান্য উনিশ-বিশ নিয়ে, কোনো দীনপালনে দাবিদার ব্যক্তি মুখ খুলতে পারে, বা পারে কি তার জবান নাপাক করতে?

চার.

ইতিহাস পাঠে আমরা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার বাইরে ভিন্ন ইঙ্গিতবহ কোনো বর্ণনা দেখলেই হকচকিয়ে যাই, বিহ্বল হয়ে পড়ি! অথচ এ-সংক্রান্ত পাঠের একদম প্রাথমিক ও মোটাদাগের একটি মূলনীতি হলো, খটকাবহ কিছু পেলে শুরুতেই সেটির সততা ও প্রমাণসিদ্ধতা নিয়ে ধৈর্য-সহ আন্তরিকভাবে মূল থেকে যাচাই করার চেষ্টা করা। তারপর ঘটনাটি যে সময়ের, যে পরিবেশের এবং যে অবস্থার, ইত্যাদি সবকিছু বিবেচনা করে দেখা যে, আসলেই উর্দিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে এর বাইরে যাওয়া সম্ভব ছিল কি না, বা বিকল্প কিছু করার সাধ্য ছিল কি না?

তাই বলা হয়, আমরা ইতিহাস পড়ি, কিন্তু সময় পড়ি না, পরিবেশ পড়ি না, অবস্থা পড়ি না, এবং উর্দিষ্ট ব্যক্তির সক্ষমতা-অক্ষমতা বিচার করি না। শুধু পড়ি, আর নিজের বোধের গম্য-অগম্য কোনো ব্যাপারে ফসকরে সিদ্ধান্ত দিয়ে রাখি। নিজের যোগ্যতার বাইরে অন্য সকলের ব্যাপারে ভুল ধরি আর অবান্তর প্রশ্ন করি। বলছি না আমি, ভুলধরা বা প্রশ্নকরা যাবে না। কিন্তু সব বিষয়ে সকলেই ভুল বা প্রশ্ন উত্থাপন করতে থাকলে, পৃথিবীর সাধারণ নীতি-শৃঙ্খলা স্থিতিশীল থাকবে না। কেউ একজন ভুল করলে, তা শোধরানোর পথ এই নয় যে, এর বিপরীতে আরেকটি ভুল করা।

পাঁচ.

হজরত উসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুমের শাহাদাতের পর, মুসলিম-বিশ্বে যে অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছিল, সেটার পূর্ব নজির ছিল না। একবারেই নতুন ও অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল ব্যাপারটা। ফলে এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে ফিকহি ইখতিলাফ থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক ও যুক্তিসংগত। যদি পূর্ব থেকেই নিষ্পত্তিকৃত বিষয় হতো, তাহলে দুপক্ষই একমত হতেন, এবং এর সহজ সমাধান বের করে বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তি করতেন।

যেহেতু সংকটটি ছিল সম্পূর্ণ নতুন, এবং পূর্ব থেকে এর কোনো ধারণা ছিল না। তাই খলিফায়ে রাশিদ হজরত আলি রাজিয়াল্লাহু আনহুমের চিন্তা ছিল,

'উসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুমের হত্যার বিচার অবশ্যই করা হবে। কিন্তু বর্তমানে রাজনৈতিক যে অস্থিরতা চলছে এর মধ্যে বিচার শুরু করলে অনেক নির্দোষ মানুষকেও হত্যা করা হতে পারে। তাই সবার আগে প্রয়োজন ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা। তারপর সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে অপরাধীদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়া।'

জেনে রাখা প্রয়োজন, বিদ্রোহীদের অনেকে পরে তওবা করে হজরত আলি রাজিয়াল্লাহু আনহুমের হাতে বাইআত হয়েছিল। এদের অনেকেই ভুল বুঝেছিল এবং হত্যায় জড়িত ছিল না। ফলে তাদেরকেও ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছিল। তা ছাড়া সাহাবিদের একাংশের ধারণা ছিল, এখন বিচার শুরু করলে ষড়যন্ত্রকারীরা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অনেক নিরপরাধ মানুষকেও ফাঁসিয়ে দিতে পারে। তাই উত্তম হবে, তাড়াহুড়া না করে সময় নিয়ে বিষয়টির সমাধান করা।

হজরত আলি রাজিয়াল্লাহু আরও চিন্তা করেন দেখেন, একাধিক কারণে ঠিক এখনই খুনিদের শাস্তি নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। কারণ খুনিরা কয়েক ভাগে বিভক্ত।

❑ আবদুল্লাহ ইবনে সাবা সবসময় পর্দার আড়ালে ছিল। সে কোনো প্রমাণ রাখেনি নিজের কাজের। এ অবস্থায় তাকে নাটের গুরু হিসেবে চিনলেও আইনিভাবে শাস্তি দেওয়া সম্ভব ছিল না।

❑ কিছু মানুষ ছিল নিরপরাধ, অথচ তাদেরকে খুনি বলে প্রচার করা হচ্ছিল। যেমন আমর ইবনুল হামিক ও আবদুর রহমান ইবনু উদাইস।

❑ হত্যাকারীদের অনেকে ঘটনাস্থলেই নিহত হয়, ফলে তাদের শাস্তি দেওয়ার প্রসঙ্গই রইল না। আবার অনেককে চিহ্নিত করা যাচ্ছিল না। ঘটনার সবচেয়ে বড় সাক্ষী ছিলেন উসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুমের স্ত্রী নায়িলা ও উসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুমের গোলাম। গোলাম তো যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হন। অপরদিকে নায়িলা স্বামীকে রক্ষা করার জন্য তার ওপর উপুড় হয়ে পড়েছিলেন। ফলে মরণাঘাত কে করেছিল তা তিনি দেখেননি।

❑ হত্যাকারীদের অনেকে সিরিয়া ও মিশরের সীমান্তে পালিয়ে যায়। এই এলাকাটি আলি রাজিয়াল্লাহু আনহুমের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। এমনকি দীর্ঘদিন এটা জানাও যায়নি তারা এখানে অবস্থান করছে।

❑ অনেকে খুন করেনি, কিন্তু বিদ্রোহে জড়িয়েছিল। এদের বড় অংশ আলি রাজিয়াল্লাহু আনহুমের হাতে বাইআত হয়, তাই তিনি চাচ্ছিলেন না কোনো যাচাই-বাছাই ছাড়াই ব্যাপকভাবে সবাইকে শাস্তি দিতে।

আলি রাজিয়াল্লাহু আনহুমের এসব বিষয় সামনে রেখে সিদ্ধান্ত নেন, বিস্তারিত অনুসন্ধান সেরে অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া হবে। অপরদিকে শুধু বিদ্রোহে জড়িত যারা ক্ষমা চাইবে, তাদের মাফ করে বাইআত গ্রহণ করা হবে।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর ঐকমত্যে, সার্বিক বিচারে হজরত আলি রাজিয়াল্লাহু আনহুমের এই সিদ্ধান্ত ছিল, সবচেয়ে বাস্তবসম্মত ও হকের অধিক নিকটবর্তী।

অপরদিকে হজরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা, তালহা ও যুবাইর রাজিয়াল্লাহু আনহুমের মত ছিল, খেলাফত লাভের পর আলি রাজিয়াল্লাহু আনহুমের দায়িত্ব হলো উসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুমের খুনিদের বিচার করা। তিনি যদি এই কাজে বিলম্ব করেন, তাহলে আমরা নিজ হাতে তাদের শাস্তি দেবো। পাশাপাশি তাঁরা এও মনে করতেন, বিদ্রোহে জড়িত সবাই সমান অপরাধী। তাদেরকেও হত্যা করতে হবে। তাঁরা হজরত আলি রাজিয়াল্লাহু

আনহুমের বাইআত ঠিক রেখে শুধু তাঁর একটি সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমত পোষণ করতেন।

অন্যদিকে হজরত মুআবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুম ও শামবাসীর মত ছিল, আলি রাজিয়াল্লাহু আনহুমের বাইআত নেওয়ার আগে খুনিদের শাস্তি নিশ্চিত করা জরুরি। তাঁরা জানিয়ে দেন, আলি রাজিয়াল্লাহু আনহুম যদি খুনিদের কিসাস কার্যকর করেন, তাহলে তাঁরা বাইআত হবেন, নইলে হবেন না। তারা বাইআতকে শর্তযুক্ত করেছিলেন কিসাস কার্যকরের সাথে।

এর বাইরেও কিছু সাহাবি ছিলেন। তারা এসব ঝামেলা থেকে মুক্ত থেকে নীরব থাকতে পছন্দ করতেন।

এ হলো, হজরত উসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুমের হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে সাহাবিদের মতপার্থক্য ও তাঁদের অবস্থান। মনে রাখতে হবে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর সকল ফকিহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, মুতাকাল্লিম, উসুলবিদ এ ব্যাপারে একমত যে, হজরত উসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুমের হত্যাকাণ্ডের মাসআলায় হজরত আলি রাজিয়াল্লাহু আনহুর মতটিই ছিল সত্যের অধিক নিকটবর্তী ও বাস্তবসম্মত। অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম, যাঁরা নিজ নিজ ইজতিহাদের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করতেন, তারাও ইজতিহাদের কারণে সওয়াবপ্রাপ্ত হবেন, ইনশাআল্লাহ।

তাই আমরা শিয়া-রাফিজিদের মতো আলি রাজিয়াল্লাহু আনহু ও আহলে বাইতের শান-মান বর্ণনা করতে করতে অন্য সাহাবিদের ব্যাপারে অশোভন মন্তব্য করব না। তেমনইভাবে নাসিবিদের মতো অন্য সাহাবিদের মর্যাদা বলতে গিয়ে আলি রাজিয়াল্লাহু আনহু ও আহলে বাইতের নির্লজ্জ বিরোধীও হব না। প্রান্তিকতা ও বাড়াবাড়ির বাইরে ভারসাম্যপূর্ণ সঠিক মতটিই হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর মত।

মাঝে মাঝে মনে হয়, কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা গাভির অভ্যন্তর দুধ-উৎপত্তির প্রকৃতি বর্ণনা করে যে উপমাটি টেনেছেন, সেটিই যেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর দৃষ্টান্ত। একবিন্দু এদিকে গেলে বর্জ্য, একবিন্দু সেদিকে গেলে রক্ত। আর প্রান্তিকতামুক্ত ভারসাম্যপূর্ণ থাকলে খাঁটি দুগ্ধ।

ছয়.

যুগ যুগ ধরে উপরিউক্ত সমাধান ও বিশ্বাসটিই মুসলিম উম্মাহর কাছে স্বীকৃত ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে প্রাচ্যবিদ ও তাদের মানসসন্তানরা, শিয়া, রাফিজি, নাসিবি ও বিদআতিরা স্বীকৃত এ বিষয়টি নিয়ে মুসলিম-সমাজে

নতুন প্রোপাগান্ডা ও সাহাবিদের শানে অশ্লীল ও কটুবাক্যের সয়লাব বইয়ে দিতে লাগল। একে কেন্দ্র করে তারা হাদিস অস্বীকার করে, প্রকারন্তরে গোটা দীন-ইসলামকে বাতিল সাব্যস্ত করতে মরিয়া হয়ে উঠল। যার কারণে আহলুস সুন্নাহর স্বীকৃত মতটি এ অঞ্চলের সাধারণ মুসলিমদের উপযোগী ভাষায় আবার নতুনরূপে তুলে ধরা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল।

আল্লাহ তাআলা সংকলক মাওলানা ইমরান রাইহানের কলমে বারাকাহ দিন। তিনি যথেষ্ট চৌকান্ন ও হুঁশিয়ারির সাথে এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর বিশুদ্ধ মতগুলো বিশ্লেষণপূর্বক তুলে ধরেছেন। আশা করি পাঠক বইখানা হাতে নিলেই বুঝতে পারবেন। পুরো ব্যাপারটিকে তিনি প্রয়োজনীয় সকল দিক উল্লেখ করে বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এ ক্ষেত্রে সমকালীন তিনজন ইতিহাসবিদ মাওলানা ইসমাইল রেহান, ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি ও ড. সুবহ আল বাদ্দাহর রচনাশৈলীকে সামনে রেখেছেন। তাঁদের লেখনী থেকে যথেষ্ট তথ্য-উপাত্ত গ্রহণ করেছেন। এ ছাড়া প্রাচীন ও উৎসগ্রন্থসমূহ থেকেও প্রচুর পরিমাণে উদ্ধৃতি নিয়েছেন। বিশেষকরে *তারিখে তবারি*, *তারিখে খলিফা ইবনু খইয়াত* ও যাহাবির *তারিখুল ইসলাম*-এর কথা তো বলাই যায়। এর বাইরে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের শেষে, আলোচনা সংশ্লিষ্ট সংশয় ও সেগুলোর সমাধান নিয়ে অল্প-বিস্তর আলাপ করেছেন, এবং পুরো ব্যাপারটির যথাসাধ্য হক আদায় করে লেখার চেষ্টা করেছেন। আল্লাহ তাঁর কলমে ও কলবে বারাকাহ দান করুন!

ওয়াহিদুর রহমান

আন্তর্জাতিক ইসলামী
বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম
২৭ রবিউল আউয়াল ১৪৪৪
৮ কার্তিক ১৪২৯
২৪ অক্টোবর ২০২২
রাত ৩টা

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসকে ঘিরে কিছু সংশয় ও তার অপনোদন

ইসলামের সূচনাকাল থেকেই শুরু হয়েছে ইসলামের বিরুদ্ধে তথ্যসন্ত্রাস। মক্কার রাস্তায় নবিজিকে পাগল বলার মাধ্যমে আবু জাহলের দল যে তথ্যসন্ত্রাসের সূচনা করেছিল, পরবর্তী দিনগুলোতে সে ধারা আরও বেগবান হয়েছে। ইউরোপিয়ান রেনেসাঁসের ফলে কুফফার গোষ্ঠী আরও একবার ইসলামের বিরুদ্ধে নিজেদের অন্ধ আক্রোশ মেটানোর সুযোগ পায়। ইসলামচর্চার নামে ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার করাকে দেওয়া হয় 'জ্ঞানতাত্ত্বিক' রূপ। নির্লজ্জ মিথ্যাচারকে নাম দেওয়া হয় 'গবেষণা'। ওরিয়েন্টালিস্টদের হাত ধরে নানা মিথ্যাচার ও সংশয় ছড়িয়ে পড়ে ইসলামের বিরুদ্ধে। মুসলিম বিশ্বে ওরিয়েন্টালিস্ট প্রভাবিত গবেষকরা এসব মিথ্যাচার গ্রহণ করেন সাদরে। তারাও একেকজন হয়ে ওঠেন তথ্যসন্ত্রাসের অন্যন্য হাতিয়ার।

ইসলামের ওপর যে-সকল আপত্তি ও সংশয় ছড়িয়ে দেওয়া হয়, তার বড় একটি অংশ আবর্তিত হয় ইসলামের ইতিহাস ঘিরে। ইসলামের ইতিহাসের কিছু ঘটনাকে ভুল ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যার মাধ্যমে মুসলমানদের অন্তরে সংশয় সৃষ্টির চেষ্টা চালানো হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এর সূচনা হয় মৃদুভাবে, ব্যক্তি নিজের অজান্তেই জড়িয়ে যায় বিভ্রান্তির জালে। ইতিহাসের কোনো বর্ণনাকে পুঁজি করে প্রশ্ন তোলা হয়, সাহাবিদের ব্যক্তিত্বের ওপর, তারা কেউ নিষ্পাপ নন বলে ভেঙে ফেলা হয় শ্রদ্ধার প্রাচীর, তারপর স্রোতের মতো ঢুকে পড়ে ইলহাদ ও ইরতিদাদ।

ওরিয়েন্টলিস্ট ও তাদের মানস-সন্তানদের বড় পুঁজি আমাদের অজ্ঞতা। ফিকহ-আকিদা ও ইতিহাসে আমাদের অজ্ঞতা তাদের জন্য তথ্যসন্ত্রাসের কাজটি করে দেয় সহজ। নিজেদের অজ্ঞতার কারণেই সহজে কুফফারদের বক্তব্যে প্রভাবিত হয় মুসলিমসমাজের একাংশ। অনেকে প্রবেশ করে ইরতিদাদের সীমানায়। আধুনিক যুগে প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে নানা অপপ্রচার বেড়েছে, মানুষও সহজে বিভ্রান্ত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে নিজেকে রক্ষার হাতিয়ার হচ্ছে, আকিদা-ফিকহ ও ইতিহাসের সমন্বিত জ্ঞানার্জন। নেককারদের সান্নিধ্য গ্রহণ।

ইসলামের ইতিহাসের ওপর সংশয় ও আপত্তি তোলার জন্য ওরিয়েন্টালিস্ট ও তাদের মানস-সন্তানরা বেশ কিছু মাধ্যম ব্যবহার করে। এই মাধ্যমগুলো সম্পর্কেও যথেষ্ট জানা থাকা প্রয়োজন।

১। মিথ্যা ইতিহাস নির্মাণ

ওরিয়েন্টালিস্টদের একটি বড় অস্ত্র হলো মিথ্যা ইতিহাস নির্মাণ। যে ঘটনা কখনো ঘটেনি তা তারা নির্মাণ করে কল্পনার মাধ্যমে। তারপর একেই প্রকৃত ইতিহাস বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। কখনো কখনো ঐতিহাসিক উপন্যাসের মোড়কে মিথ্যা কাহিনি নির্মাণ করে একেই প্রকৃত ইতিহাস বলে প্রচার করা হয়। গত শতাব্দীতে জুরজি জায়দান, এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ, হাবিব জামাতি তাদের লিখিত বইপত্রে মিথ্যা ইতিহাস নির্মাণ করেছে। এই শতাব্দীতে তারিক আলি, ইউভাল নোয়া হারিরিসহ অন্যরা কাজ করে যাচ্ছে। এদের কেউ সরাসরি প্রাচ্যবিদ আবার কেউ প্রাচ্যবিদদের মানসপুত্র। এভাবে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করছে মিথ্যা ইতিহাস, অনেকে তা গ্রহণ করছে বাছবিচার না করেই। মিথ্যা ইতিহাস প্রচারের জন্য রচিত হচ্ছে বইপত্র, কাজে লাগানো হচ্ছে মিডিয়াকে।

২। ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা

মুসলিম অধ্যুষিত বেশিরভাগ রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থা হলো সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা। এই শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলাম ও ইসলামের ইতিহাস বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হলেও তা পড়াচ্ছে সেক্যুলার কিংবা সেক্যুলার চিন্তায় প্রভাবিত শিক্ষকরা। ফলে তাদের আলোচনায় কিংবা লেখায় ফুটে উঠছে সেক্যুলার চিন্তার প্রতিফলন। ইসলামের ইতিহাস হারাচ্ছে তার আবেদন ও রুহানিয়াত। শিক্ষকদের মাধ্যমে প্রভাবিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরাও। তাই ইসলামিক স্টাডিজ কিংবা ইসলামের ইতিহাস পাঠ করেও তাদের জীবনযাত্রায় আসছে না কোনো পরিবর্তন। চিন্তার জগৎও আচ্ছন্ন হয়ে থাকছে পশ্চিমা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনায়।

সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থার বড় সমস্যা হলো, পূর্ববর্তী ইতিহাসবিদদের লেখার ধরন ও শৈলী সম্পর্কে অজ্ঞতা। ইতিহাসবিদরা তাদের লেখার ক্ষেত্রে কোন নীতি সামনে রেখেছিলেন, তা না জেনেই তাদের সকল বর্ণনা গ্রহণ করে ফেলা হয়। ইমাম তবারির কথাই ধরা যাক। একজন দক্ষ ইতিহাসবিদ হিসেবে তিনি পরিচিত। অনেকেই *তারিখুত তবারি* যেকোনো বর্ণনা সামনে পেলে তা গ্রহণ করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। অথচ ইমাম তবারি তার গ্রন্থের ভূমিকাতেই লিখেছেন,

> ‘আমার এই গ্রন্থে এমন কিছু বর্ণনাও আছে যা পাঠক পছন্দ করবে না, শ্রোতারাও গ্রহণ করবে না। এর সত্যতা ও বিশুদ্ধতা নিয়ে তারা প্রশ্ন

তুলবে। তাহলে জেনে রাখুন, এসব বর্ণনা আমাদের পক্ষ থেকে নয়, বরং আমাদের কাছে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে আমরা সেভাবে উদ্ধৃত করেছি শুধু।''[১]

ইমাম তবারি স্পষ্টতই জানাচ্ছেন, তাঁর বর্ণিত সকল ইতিহাস বিশুদ্ধ নয়। বাস্তবতাও এমনই। তিনি শুধু নির্দিষ্ট বিষয়ে সকল তথ্য জমা করেছেন। নির্দিষ্ট কোনো তথ্যকে প্রাধান্য দেননি। যেমন *তারিখুত তবারি*তে আবু মিখনাফের ৫৮৫টি বর্ণনা আছে। অথচ একজন মিথ্যুক রাবি হিসেবে সে সবার কাছে পরিচিত। এভাবে সাইফ বিন উমর তামিমি ও মুহাম্মদ বিন সায়িব কালবি থেকেও এনেছেন অনেক বর্ণনা যাদের কেউই গ্রহণযোগ্য নন।[২] কিন্তু সেক্যুলার ধারায় এই বিষয়গুলো আলোচিত হয় না। বরং আগ বেড়ে এও বলা যায় যে, তাদের জ্ঞানতত্ত্বে এ ধারার আলোচনার কোনো পদ্ধতিই নেই। ফলত তারা সকল ধরনের বর্ণনাকে এক মান দিয়ে দেয়।

সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি হলো, এর কারণে ইসলামের ইতিহাস পাঠের পদ্ধতি বদলে দেওয়া হয়। দুর্বল করা হয়, ইতিহাস যাচাইয়ের মূলনীতিগুলো। ফলে এখানে যাহাবি ও মাসউদি দুজনের ইতিহাসের মানই ধরা হয় সমান। মিথ্যুক শিয়া রাবিদের বর্ণিত ইতিহাস আর সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য রাবিদের বর্ণিত ইতিহাসে করা হয় না কোনো তফাৎ। ফলে প্রকৃত ইতিহাস আর বানোয়াট ইতিহাস মিশ্রিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ইসলামের ইতিহাস পাঠে যে সঞ্জীবনী চেতনা জাগ্রত হওয়ার কথা ছিল, তাও হচ্ছে না অর্জিত। মুসলমানদের ইতিহাসের প্রতি সংশয় সৃষ্টির জন্য আরেকটি প্রধান প্রভাবক এই ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা।[৩]

৩। প্রাচ্যবাদী বিশ্লেষণের প্রতি অতিরিক্ত সুধারণা ও আস্থা

মুসলিম সমাজে শিক্ষিত লোকজনের একটি বড় অংশ এখনো ইতিহাস ব্যাখ্যার প্রাচ্যবাদী ধারার প্রতি অতিরিক্ত সুধারণা ও আস্থা রাখেন। তাদের মতে প্রাচ্যবাদীরা সঠিক ইতিহাস বর্ণনা করেন, এবং নিরপেক্ষ ও নির্মোহ বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন। ফলে ইতিহাসের বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রাচ্যবাদীদের বইপত্র পড়ার বিকল্প নেই।

---

১. *তারিখুত তবারি*, ১/৮

২. এই বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, *তাহযিবুত তাহযিব*, *মিযানুল ইতিদাল*।

৩. বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনার্স ও মাস্টার্স লেভেলে যে ইতিহাসগ্রন্থ পড়ানো হয় সেগুলো মূলত রচিত হয়েছে পি. কে. হিট্টি, আমির আলি ও প্রমুখের বইয়ের ওপর ভিত্তি করে। এই বইগুলোর বেশিরভাগ লেখকই আরবি জানেন না, ফলে তারা ইতিহাসের মূল উৎস থেকে তথ্য নেওয়ার বদলে ইংরেজিতে রচিত অনির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে তথ্য নেন।

ওরিয়েন্টালিস্টদের মধ্যে দুয়েকজন নিরপেক্ষ গবেষক থাকলেও তাদের বেশিরভাগ নিরপেক্ষ নন। তারা ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্রের নানা দিক নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করেন, ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্র বিকশিত করার জন্য নয়, বরং এর ওপর আপত্তি ও সংশয় তুলে দেওয়ার জন্য। তাদের বইগুলো রচিত হয়, আকর্ষণীয় উপস্থাপনায়, তাতে থাকে তথ্যের সমাহার, কিন্তু একইসাথে তাতে থাকে সন্দেহ ও সংশয়ের বিষ। ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্র নিয়ে কথিত গবেষণা মূলত একেকটি বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেড, যেখানে তারা কেবলই একজন শত্রু যোদ্ধা। ফলে ইসলামের ওপর আক্রমণের যতগুলো সুযোগ আসে, তার কোনোটিই হাতছাড়া করতে তারা নারাজ। যেমন প্রসিদ্ধ ওরিয়েন্টালিস্ট মন্টেগোমারি ওয়াট (Montgomery watt)[৪] তার লিখিত *মুহাম্মদ এট মক্কা* (Muhammad at mecca) গ্রন্থে লিখেছেন, 'মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হেরা গুহায় যেতেন মক্কার তাপদাহ থেকে বাঁচার জন্য, এর পেছনে ইবাদত বা ধার্মিকতার কোনো কারণ ছিল না।'[৫] (নাউজুবিল্লাহ)

২০০৬ সালে রয় জ্যাকসন (Roy jackson)[৬] নামে একজন ওরিয়েন্টালিস্ট *ফিফটি কে ফিগারস ইন ইসলাম* (Fifty key figures in islam) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাতে তিনি দাবি করেন, সাহাবায়ে কেরামের যুদ্ধাভিযানের উদ্দেশ্য ছিল সম্পদ উপার্জন। যদি সম্পদ উপার্জনের কোনো প্রয়োজনীয়তা তাদের না থাকত, তাহলে তারা আরবের সীমানার বাইরে যেতেন না।[৭]

মাইকেল এইচ হার্ট (Michael H. hart)-এর[৮] কথাই ধরা যাক। তার লিখিত *দ্যা হান্ড্রেড* (The ১০০) বইটি এখনো মুসলিম সমাজের অনেকে আগ্রহভরে পাঠ করে। এমনকি নবিজির নবুয়তের দলিল দিতে গিয়েও অনেকে এই বইয়ের উদ্ধৃতি দেন। অথচ এই বইয়ের শুরুতেই নবিজির চরিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে সেক্যুলার

৪. ডব্লিউ মন্টেগোমারি ওয়াট W. Montgomery watt–এর জন্ম ১৯০৯ সালে স্কটল্যান্ডে। দীর্ঘসময় তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি *মুহাম্মদ এট মক্কা* ও *মুহাম্মদ এট মাদিনা* নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করে বেশ প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। ২০০৬ সালে তিনি মারা যান।

৫. *মুহাম্মদ এট মক্কা*, ১০২

৬. রয় জ্যাকসন Roy jackson–এর জন্ম ১৯৬২ সালে। বর্তমানে তিনি ইউনিভার্সিটি অব গ্লস্টারশায়ারে ধর্ম ও দর্শন বিভাগে অধ্যাপনা করছেন।

৭. *ফিফটি কি ফিগারস ইন ইসলাম*, ৬৭

৮. মাইকেল এইচ হার্ট Michael H. hart–এর জন্ম নিউ ইয়র্কে, ১৯৩২ সালে। তিনি প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি *দ্যা হান্ড্রেড* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যেখানে ইতিহাসের বিখ্যাত ১০০ মানুষের জীবনী তুলে ধরা হয়। প্রকাশের পর বইটি সাড়া ফেলে। অল্পদিনেই এর ৫ লক্ষ কপি বিক্রি হয় এবং নানা ভাষায় বইটি অনুবাদ হয়। এই বইয়ের প্রথম স্থান নবিজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেওয়ায় মুসলিম সমাজেও বইটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

মাপকাঠিতে। এই বইয়ে এক নাম্বার স্থান নবিজিকে দেওয়া হলেও ১০০ শ্রেষ্ঠ মানুষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, চেংগিস খান ও হিটলারের মতো খুনিদেরকেও। এই বইয়ে লেখক ভালো মানুষ ও অপরাধীর কোনো তফাত করেনি, যোগ্য-অযোগ্যের ভেদ করেনি।

আলোচনা দীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কায় একটি উদাহরণ দিয়েই আলোচনা শেষ করতে হচ্ছে। ওরিয়েন্টালিস্টদের প্রায় সবার লেখাই এমন বিষে পরিপূর্ণ। তারা নিরপেক্ষ নন, বরং তারা বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডের একেকজন ক্রুসেডার। তাদের লেখা পাঠে ইসলামের প্রতি জ্ঞান দৃঢ় হওয়ার বদলে সৃষ্টি হয়, নতুন নতুন সংশয়।

৪। ভ্রান্ত ফিরকাদের কর্মতৎপরতা

বিভিন্ন বাতিল ফিরকা তাদের নিজেদের স্বার্থে নানা সময় ইতিহাস বিকৃত করে। যেমন শিয়াদের একটি বড় অংশ বাগদাদ পতনের ইতিহাস বিকৃত করে ইবনুল আলকামির অপরাধ আড়াল করে। কেউ কেউ তৈমুর লং কিংবা চেংগিস খানের জুলুম-অত্যাচার আড়াল করে। ভারতে হিন্দুত্ববাদী শক্তি মুসলিম শাসনের ইতিহাস বিকৃত করে এবং মুসলিম শাসকদের চরিত্রে কালিমা লেপন করে।

প্রখ্যাত মিশরীয় লেখক মাহমুদ ইসমাইল محمود إسماعيل [৯] তার লিখিত *আল-হারাকাতুস সিরিয়্যাহ ফিল ইসলাম* الحركات السرية في الإسلام গ্রন্থে দাবি করেছেন, বিভিন্ন সশস্ত্র ফিরকা যেমন ইসমাইলি, কারামেতা, খাওয়ারিজ, জাঞ্জ, উবাইদি ইত্যাদির জন্ম হয়, সমাজে চলমান জুলুম, বেইনসাফি ও অন্যায় প্রতিরোধে। তারা ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতে থাকে।[১০]

বলাবাহুল্য, মাহমুদ ইসমাইলের এমন দাবির পক্ষে, কোনো ঐতিহাসিক দলিল-প্রমাণ নেই। এই দলগুলো ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেনি, উলটো তারা সমাজে অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা ও অন্যায় ছড়িয়েছে। নিরপরাধ মানুষের রক্তে নিজেদের হাত রাঙিয়েছে। ইতিহাসের সকল তথ্যপ্রমাণ এদিকেই নির্দেশ করে। তবু মাহমুদ ইসমাইল নিজের ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাসের কারণে তাদের প্রতি পক্ষপাত করেছেন।

এভাবে বাতিল আকিদাপন্থী লেখকের কারণেও ইতিহাস বিকৃত হয় এবং বিশুদ্ধ ইতিহাসের প্রতি সংশয় সৃষ্টি হয়।

---

৯. মাহমুদ ইসমাইলের জন্ম ১৯৪০ সালে। তাকে ইসলামের ইতিহাস ও সভ্যতা বিষয়ের একজন গবেষক বলে গণ্য করা হয়।

১০. *আল-হারাকাতুস সিরিয়্যাহ ফিল ইসলাম*, ১২-১৬

৫। নাটক, সিরিয়াল ও সিনেমাকে ইতিহাস শেখার বিশ্বস্ত মাধ্যম মনে করা

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ঐতিহাসিক নাটক, সিরিয়াল ও সিনেমা নির্মাণের প্রবণতা বেড়েছে। সামান্য একটু ইতিহাসের উপাদান আর স্বাধীন কল্পনা দিয়ে নির্মিত হচ্ছে এসব সিরিয়াল, সিনেমা। এসব সিরিয়াল-সিনেমায় ইতিহাসের নির্দিষ্ট কোনো অংশ কিংবা ঐতিহাসিক কোনো চরিত্রের জীবন চিত্রায়ণ করা হচ্ছে। একে সত্য ইতিহাস মনে করে লুফে নিচ্ছে অনেকে।

এসব সিরিয়াল-সিনেমায় বিকৃত করা হচ্ছে ইতিহাস, ঐতিহাসিক চরিত্রের উপস্থাপন করা হচ্ছে ভিন্নভাবে। ফলে প্রকৃত ইতিহাস ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। মানুষ জানছে ভুল ইতিহাস ও ভুল তথ্য। ভুল মাধ্যম থেকে ইতিহাস শেখার কারণেও ইতিহাসের প্রতি সংশয়-সন্দেহ তৈরির প্রবণতা বাড়ছে।

সংশয়ের প্রতিকার

১। ইসলামের ইতিহাস-দর্শন অনুধাবন ও এর সুষ্ঠু প্রয়োগ

ইসলামের ইতিহাস কোনো নীরস শাস্ত্র নয়, যেখানে কিছু তথ্য নেওয়াই মূল উদ্দেশ্য। বরং ইসলামে ইতিহাসচর্চার রয়েছে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কুরআন কারিম ইতিহাসচর্চার উদ্দেশ্যকে ব্যক্ত করেছে এভাবে,

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾

তাদের কাহিনিতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়।[১১]

এই আয়াতে আল্লাহ ইতিহাসচর্চার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন শিক্ষা অর্জনকে। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ জাতিসমূহের পতনের কারণ নির্দেশ করেছেন যা থেকে ইতিহাস দর্শনের মূলনীতিগুলো জানা যায়। এসব সামনে রেখেই আমাদের ইতিহাস পাঠ করতে হবে। ত্যাগ করতে হবে বস্তুবাদী ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। ইসলামের ইতিহাস দর্শনের আলোকে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করা না হলে ইতিহাস থেকে প্রকৃত জ্ঞান ও শিক্ষা অর্জন করা সম্ভব হবে না। কুরআনের আলোকে ইসলামের ইতিহাস দর্শন এবং তা ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের উপায় সম্পর্কে জানতে নিম্নের বইগুলো পড়া যেতে পারে।

দিরাসাতুন লিসুকুতি সালাসিনা দাউলাতিন ইসলামিয়্যাতিন – আবদুল হালিম উওয়াইস।[১২]

---

১১. সুরা ইউসুফ, ১১১

১২. মিশরীয় একজন ইতিহাসবিদ। জন্ম ১৯৪৩ সালে, মৃত্যু ২০১২ সালে। তার লিখিত বইটির নামের আরবিরূপ হলো, دِراسَةٌ لِسُقوطِ ثَلاثِيْن دَولَةٍ إِسْلامِيَّةٍ

ফিকহুত তামকিন ইনদা দাওলাতিল মুরাবিতিন – আলি মুহাম্মদ আস-সাল্লাবি।[১৩]
আত-তাফসিরুল ইসলামিয়্যু লিত-তারিখ – ইমাদুদ্দিন খলিল।[১৪]

২। ইতিহাস পর্যালোচনার ক্ষেত্রে ইলমি মানহাজ (পদ্ধতি) অনুসরণ করা

ইসলামে ইতিহাসশাস্ত্র কোনো রূপকথা কিংবা লোককথা নয়। বরং এই শাস্ত্র প্রণয়ন করা হয়েছে সুবিন্যস্তভাবে। এর রয়েছে নিজস্ব উসুল ও মূলনীতি। সুতরাং ইতিহাসের কোনো বর্ণনা বা বিশ্লেষণ গ্রহণের ক্ষেত্রে এর নিজস্ব উসুলের আলোকেই গ্রহণ করতে হবে। সেক্যুলার ধারার মতো ইতিহাসকে লাগামহীন ছেড়ে দিলে হবে না, বরং একে শাস্ত্রীয়ভাবেই পাঠ করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত ইতিহাসশাস্ত্রের মূলনীতির আলোকে একে পাঠ করা না হবে ততক্ষণ এ থেকে উপকৃত হওয়া যাবে না। ইতিহাসশাস্ত্রের মূলনীতিগুলো জানতে দেখুন—

আল-ইলান বিত-তাওবিখ লিমান যাম্মা আহলাত তারিখ – আল্লামা সাখাবি।[১৫]
দিরাসাতুন তারিখিয়্যাতুন মানহাজিয়্যাতুন নকদিয়্যাহ – ডক্টর মুসা শরিফ।[১৬]

৩। তাহকিক ও বিশ্লেষণের প্রতি জোরদান

ইতিহাসশাস্ত্রে রচিত বইগুলোর বেশিরভাগ নানা মিথ্যা ও ভুল বর্ণনা দ্বারা পরিপূর্ণ।[১৭] নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে ওরিয়েন্টালিস্টরা প্রায়ই এসব বর্ণনাকে কাজে লাগায়। ফলে ইতিহাস পাঠের ক্ষেত্রে বিস্তারিত তাহকিক ও বিশ্লেষণ করার বিকল্প নেই। তাহকিকের মাত্রা যত বাড়বে ততই নানা আপত্তি ও সংশয়ের জবাব স্পষ্ট হবে।

সাধারণ মানুষের জন্য তাহকিকের কাজটি কঠিন, ফলে তাদের উচিত সমকালীন আলেমদের রচিত গ্রন্থ পাঠ করা যেখানে তারা পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলোর তথ্য তাহকিক করে প্রকাশ করেছেন। যেমন মাওলানা ইসমাইল রেহান, আলি সাল্লাবি প্রমুখের লেখার কথা বলা যায়।

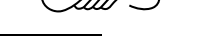

১৩. বইটির নামের আরবিরূপ হলো, فِقْهُ التَّمْكِينِ عِندَ دَوْلَةِ المُرابِطِينَ
১৪. ইতিহাস বিষয়ক একাধিক গ্রন্থ প্রণেতা। ১৯৬৩ সালে লিবিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ওপরে বর্ণিত তার বইটির নামের আরবিরূপ হলো, التَّفْسِيرُ الإِسْلامِيُّ لِلتَّارِيخِ
১৫. আল্লামা সাখাবির জন্ম ১৪২৮ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি ছিলেন ইবনে হাজার আসকালানির ছাত্র। ইতিহাস ও হাদিস বিষয়ে তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। ১৪৯৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইনতিকাল করেন। ওপরে বর্ণিত তার বইটির নামের আরবিরূপ হলো, الإِعْلامُ بِالتَّوبِيخِ لِمَنْ ذَمَّ أَهْلَ التَّارِيخِ
১৬. শায়খ মুসা শরিফের জন্ম সৌদি আরবে, ১৯৬১ সালে। ইতিহাস বিষয়ক আলোচনা ও লেখালেখির জন্য তিনি প্রসিদ্ধ। বর্তমানে তিনি সৌদি আরবের কারাগারে আছেন। ফাক্কাল্লাহু আসরাহু। ওপরে বর্ণিত তার বইটির নামের আরবিরূপ হলো, دِرَاسَةٌ تَارِيخِيَّةٌ مَنْهَجِيَّةٌ نَقْدِيَّةٌ
১৭. এর কারণ সম্পর্কে সামনে আলোচনা হবে। ইনশাআল্লাহ।

মুশাজারাতে সাহাবা - মূলনীতি ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুশাজারাহ শব্দটি শাজারুন (শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট বৃক্ষ) ধাতুমূল থেকে নির্গত। বাতাসের দোলায় শাখাপ্রশাখার পরস্পর সংঘর্ষ থেকে রূপক অর্থে পারস্পরিক বিরোধ-সংঘর্ষকে মুশাজারাহ বলা হয়। মাজলুম সাহাবি উসমান রা.-এর শাহাদাতের পর নানা ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে সৃষ্ট মতবিরোধ ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের রূপ ধারণ করেছিল, কিন্তু উম্মতের উলামায়ে কেরাম আদবের খাতিরে সেই যুদ্ধকে মুশাজারাহ নামে অভিহিত করেছেন। তারা বোঝাতে চেয়েছেন, শাখাপ্রশাখার পারস্পরিক সংঘর্ষ যেমন বৃক্ষের জন্য দোষণীয় নয়, তেমনই পারস্পরিক ভিন্ন ইজতিহাদের কারণে সাহাবিদের অন্তর্বিরোধও সামগ্রিক বিচারে দোষণীয় নয়।[১৮]

মুশাজারাতে সাহাবা ইসলামের ইতিহাসের এমন এক সত্য, যা বিব্রতকর, কিন্তু একে এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। এটি এমন স্পর্শকাতর বিষয়, যেখানে বোঝার সামান্য ভুল ডেকে আনে আকিদার বিচ্যুতি। মুশাজারাতে সাহাবা নিয়ে আমাদের সমাজে যে আলোচনা প্রচলিত, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা ভুল তথ্য ও ভুল বিশ্লেষণে পরিপূর্ণ। মুশাজারাতে সাহাবা, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যকার সেই ইখতিলাফ বা মতভিন্নতা যা নবিজির ইনতিকালের ৩০ বছরের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। যেখানে দুপক্ষেই শীর্ষ সাহাবিরা অবস্থান করেছিলেন। এই ইখতিলাফের ফলে 'জংগে জামাল' ও 'জংগে সিফফিন' নামে দুটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যেখানে দুপক্ষেরই রক্ত ঝরে। মুশাজারাতে সাহাবাকে কেন্দ্র করেই আকিদার ক্ষেত্রে নতুন নতুন দল-উপদল গড়ে ওঠে, পরবর্তী সময়ে যারা আকিদার বিচ্যুতি ছড়ায় সমাজে।

মুশাজারাতে সাহাবা এমন এক কাঁটাযুক্ত ঝোপ, যেখানে পথ চলতে হয় সাবধানে, সতর্ক হয়ে। যেখানে পদে পদে অপেক্ষা করছে সাবায়ি, শিয়া, খাওয়ারিজ ও নাসিবিদের তৈরি জাল বর্ণনার ফাঁদ। এ ফাঁদ সতর্কতার সাথে এড়াতে না পারলে আটকা পড়তে হয় বিভ্রান্তির জালে। আকিদা হয়ে ওঠে নড়বড়ে। তাই মুশাজারাতে সাহাবার ইতিহাস আলোচনার আগে আমরা এ সংক্রান্ত কিছু মূলনীতি জেনে নিই।

---

১৮. *মাকামে সাহাবা*, ৭২

মূলনীতিসমূহ

১। সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আকিদা-বিশ্বাসের মূল মাপকাঠি হলো কুরআন, সুন্নাহ ও আকিদার গ্রন্থাবলি। এই তিন উৎস থেকে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আকিদা নির্ধারণ করার পর ইতিহাসের কোনো সূত্র যদি এর বিপরীত আকিদা উপস্থাপন করে, তাহলে তা পরিত্যাজ্য। কারণ ইতিহাসের কোনো বর্ণনা আকিদা নয়, তা কেবল ঐতিহাসিক তথ্য মাত্র, এবং যার নির্ভরযোগ্যতা বিশ্লেষণ ও যাচাই-বাচাইকরণের ওপর আরোপিত।

২। জুমহুর বা সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের মতে নবিদের পর উম্মতের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন হজরত আবু বকর রা., তারপর হজরত উমর রা., তারপর হজরত উসমান রা., তারপর হজরত আলি রা.। তারা সবাই-ই খুলাফায়ে রাশিদিন, হেদায়াতের ইমাম।

৩। নবিজির সকল সাহাবিকে আমরা ভালোবাসব। কারও ভালোবাসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করব না, কাউকে ঘৃণা বা গালমন্দ করব না। আমরা শুধু তাদের ভালো দিকগুলোই আলোচনা করব, কারণ তাদের ঘৃণা করা কুফর, মুনাফিকি ও চরম অবাধ্যতা।[১৯]

৪। সাহাবিদের মধ্যকার সর্বনিম্ন স্তরের সাহাবিও, সাহাবি নয়, এমন সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ থেকে উত্তম। সাহাবি নয়, এমন ব্যক্তি যত নেক আমল নিয়েই আল্লাহর সামনে উপস্থিত হন, তার চেয়ে একজন সাহাবির মর্যাদা ও সম্মান অনেক বেশি। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারককে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কে উত্তম? হজরত মুআবিয়া নাকি উমর ইবনে আবদুল আজিজ। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, হজরত মুআবিয়া রা. নবিজির সাথে যুদ্ধ করা অবস্থায় তার নাকে যে ধুলা লেগেছিল তাও উমর ইবনে আবদুল আজিজ থেকে উত্তম।[২০]

৫। সাহাবিদের গালমন্দ করা রাফিজিদের কাজ। আহলে বাইতের নিন্দা করা নাসিবিদের কাজ। এই দুই দলই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআত থেকে বিচ্যুত। আমরা দুদলের কোনো দলের সাথেই সম্পর্ক রাখি না। তাদের বিশ্বাস লালন করি না। ফলে মুশাজারাতে সাহাবার ইতিহাস পাঠকালে আমরা কোনো সাহাবির নিন্দা করব না, আহলে বাইতের কোনো সদস্যের অমর্যাদা করব না।

৬। অনেকে সাহাবিদের দোষ ধরার জন্য বিভিন্ন হাদিস উপস্থাপন করে। তারা প্রমাণ করতে চায়, হাদিসের আলোকেই সাহাবিদের অপরাধী সাব্যস্ত করা

---

১৯. *আল-আকিদাতুত তহাবিয়্যা*, ৮১

২০. *ওফায়াতুল আয়ান*, ৩/৩৩

যায়। এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে এ ধরনের বেশিরভাগ হাদিসই বানোয়াট বা জাল। এর বাইরে কিছু হাদিস আছে যেখানে ভুল ব্যাখ্যা করা হয়। অর্থাৎ হাদিসটি ছিল প্রশংসার কিন্তু ভুল ব্যাখ্যা করে একে নিন্দার হাদিস বলা হয়। কিছু হাদিসের ভুল অনুবাদ উপস্থাপন করা হয়। অল্প দুয়েকটি হাদিসের মাধ্যমে সাহাবিদের কিছু ভুল প্রমাণ হয়। এ ক্ষেত্রে আমাদের আকিদা সাহাবিরা মাসুম (নিষ্পাপ) নন, মাগফুর (ক্ষমাপ্রাপ্ত)।

এই মূলনীতি মাথায় রেখে হাদিসগুলো পাঠ করলে দেখা যাবে হাদিসটি কোনো না কোনো শ্রেণিতে পড়ে যাচ্ছে। ফলে বিভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকা সহজ হবে।

৭। সাহাবিদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে প্রতিটি পক্ষের সামনেই দলিল ছিল, এবং ছিল নিজ নিজ ইজতিহাদ। ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তাদের কারও ভুল হয়েছে, কেউ সঠিক মতের ওপর ছিলেন। কাদের ইজতিহাদ সঠিক ছিল, তাও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআতের আলেমরা জানিয়েছেন, কিন্তু কারও পক্ষ নিয়ে কাউকে গালমন্দ করার অনুমতি দেননি কেউই। সুতরাং মুশাজারাতে সাহাবার ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে আমরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআতের অবস্থান জেনে নেব, কিন্তু সাহাবিদের কারও ব্যাপারে কোনো বাজে মন্তব্য করব না, এমনকি নেতিবাচক মানসিকতাও লালন করব না।

৮। মুশাজারাতে সাহাবার ইতিহাসগুলো বর্ণিত হয়েছে বিশ্বস্ত-অবিশ্বস্ত দুই মাধ্যমেই। তাই কোনো বর্ণনা সামনে এলে প্রথমে যাচাই করতে হবে, মাধ্যমটি বিশ্বস্ত কি না। বর্ণনার সনদ সহিহ কি না। এই যাচাইয়ের আগে কোনো বর্ণনা দেখেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না।

৯। ইতিহাসবিদরা তাদের গ্রন্থে কোনো তথ্য বা বিবরণ উল্লেখ করার মানে এই নয় যে, এর সাথে তিনি শতভাগ একমত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইমাম তবারি তার *তারিখুত তবারি*তে একই বিষয়ে বিপরীতমুখী দুটি বর্ণনাও এনেছেন। অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য ছিল, শুধু সংকলন। নির্দিষ্ট তথ্যকে প্রাধান্য দেওয়া নয়। মুফতি শফি রহ. এ সম্পর্কে লিখেছেন, ইতিহাসশাস্ত্রের আলোচনার সময় ইতিহাসবিদদের অনেকেই চেয়েছেন সকল ধরনের বর্ণনাকে একত্র করে ফেলতে। তারা চাচ্ছিলেন এসব যাচাই-বাছাইয়ের কাজটি পরে অন্য কেউ এসে করুক। সুতরাং কেউ যদি ঐতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা আকিদা সম্পর্কিত কোনো বিষয় প্রমাণ করতে চায় তাহলে জরাহ-তাদিল (কোনো বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতা বা অনির্ভরযোগ্যতা বিষয়ক শাস্ত্র)-এর মূলনীতি অনুসারে সেসবকে যাচাই করতে হবে। বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়া এসব বর্ণনা গ্রহণের কোনো

সুযোগ নেই। অমুক ইমাম উল্লেখ করেছেন, তমুক মুহাদ্দিসের ইতিহাসগ্রন্থে পাওয়া গেছে, স্রেফ এটুকু বলে দায়িত্বমুক্ত হওয়ার সুযোগ নেই।[২১]

১০। মুশাজারাতে সাহাবা পাঠের উদ্দেশ্য এই নয় যে, সাহাবায়ে কেরামের মাঝে কে অপরাধী ছিলেন, কে জালেম ছিলেন তা নির্ধারণ করা। বরং মুশাজারাতে সাহাবা পাঠের উদ্দেশ্য, এ সম্পর্কে বিশুদ্ধ ইতিহাস জানা এবং আরোপিত সংশয় ও সন্দেহের জবাব দেওয়া। মুশাজারাতে সাহাবা পাঠের মূল উদ্দেশ্য সাহাবায়ে কেরামের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা। এই বিষয়টি মাথায় রেখে মুশাজারাতে সাহাবার ইতিহাস পাঠ করলে, অনেক বিভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকা যাবে ইনশাআল্লাহ।

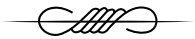

২১. *মাকামে সাহাবা*, ২৬, ২৭